Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501047 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Studies on Madhusudan in 'Masik Basumati' Magazine
মাসিক বসুমতী পত্রিকায় মধুসূদন চর্চা

Dr. Pinki Mondal
S.A.C.T
Bengali Department
Suri Vidyasagar College, Suri, Birbhum

Received on: 13th May 2026
Accepted on: 24th May 2026

Abstract:
The advent of Michael Madhusudan Dutta in nineteenth-century Bengali literature is widely regarded as analogous to a Renaissance. Emerging during the formative phase of Bengali literary modernity, Dutta's robust, life-affirming genius marked an unprecedented development in the tradition. His literary corpus embodies a synthesis of the zeitgeist and individual creative intellect, distinguished not by adherence to a specific religious or philosophical doctrine, but by an unparalleled aesthetic consciousness and a profound engagement with life. These qualities have ensured the enduring relevance of his work across two centuries of critical discourse. This study examines the critical reception of Dutta in Masik Basumati a prominent Bengali periodical of the early to mid-twentieth century, alongside contemporaries such as Prabasi, SabujPatra, Bharatbarsha, and Kallol. Between the 1920s and 1960s, Masik Basumati published more than ten essays on Dutta, reflecting diverse methodological and interpretive approaches. By analyzing these essays, the paper argues that the journal's engagement with Dutta's individual genius and literary practice constitutes a significant yet understudied chapter in the historiography of Bengali literary criticism. The findings suggest that Dutta's oeuvre resists monolithic theoretical categorization and continues to demand pluralistic critical frameworks.

Key Words:
Michael Madhusudan Dutta, Masik Basumati, Bengali literary criticism, nineteenth-century literature, Renaissance, modernity

মূল প্রবন্ধ

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রেনেসাঁসের মতোই মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব। আধুনিক সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে এই বলিষ্ঠ জীবনবাদী প্রতিভাকে পাওয়া বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ছিল বিস্ময়কর প্রাপ্তি যোগ। তাঁর সাহিত্য হলো যুগমানস ও ব্যক্তি-প্রতিভার যুগপৎ

© Santiniketan Sahityapath

সমন্বয়ের ফলশ্রুতি। মধুসূদনের স্বল্প পরিসর কাব্য জীবনে বিশেষ কোনো ধর্ম বিশ্বাস বা দার্শনিক মতবাদ নেই। কেবলমাত্র শিল্পচেতনার চরমোৎকর্ষ এবং জীবনবাদের তীব্রতা তাঁর সাহিত্যকে দ্বিশতবর্ষ পরেও করেছে চিরভাস্বর। তাঁর সাহিত্য সেই গুরুত্বেই আজও আলোচিত, সমালোচিত। মধুসূদনের প্রতিভার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেছেন — "নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড়ো কবি।... এক শতাব্দীর ব্যবধানে আজও কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কিছু হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় না... বাংলা সাহিত্যকে তিনি একা যতটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ তা করেননি।"[১] তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ অতিক্রম করে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে মধুসূদনের কোনো পূর্বসূরি নেই, নেই উত্তরসূরিও।

এই দুইশত বর্ষ জুড়ে তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকায় নানান আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। একমাত্রিক কোনো তত্ত্বায়নে তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'ভারতবর্ষ', 'কল্লোলে'র পাশাপাশি অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী'। এই পত্রিকায় মধুসূদন বিষয়ক প্রায় দশটির বেশি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির রচনাকাল বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের মধ্যে। এখানে আলোচিত হয়েছে মহাকবি মধুসূদন, তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্য, নাট্যকার মধুসূদন, প্রহসনকার মধুসূদন, মধুসূদনের সাহিত্যে নারী, চতুর্দশপদী কবিতায় মহাকবি মধুসূদন, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে। এই প্রবন্ধে আমরা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত মধুসূদন বিষয়ক সেই সব রচনার প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। সেই সব প্রবন্ধে রয়েছে মধুসূদনের সাহিত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করবার প্রয়াস। মধুসূদনের ব্যক্তি প্রতিভা ও তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে 'মাসিক বসুমতী'র এই সমালোচনা উজ্জ্বল একটি অধ্যায়।

২

মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লিখেছিলেন — "স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশ?... ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন — ইউরোপ সহায় — সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও — তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন।"[২] বাংলা সাহিত্যে মহাকবি বলে মধুসূদনকেই অভিহিত করা যায়। কারণ তিনি কেবল মহাকাব্যের রচয়িতা নন, বাংলা সাহিত্যে তিনিই মহাকাব্যের প্রথম স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত সুরেশচন্দ্র ঘোষের 'মহাকবি মধুসূদন' (কার্ত্তিক ১৩৪১), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'মধুসূদন' (ভাদ্র ১৩৬০) এবং মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের 'কবি শ্রীমধুসূদন' (মাঘ ১৩৬০) এই তিনটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে মহাকবি মধুসূদন প্রসঙ্গটি।

সুরেশচন্দ্র ঘোষের 'মহাকবি মধুসূদন' প্রবন্ধটি আকারে দীর্ঘ, বিস্তারিত সমালোচনা করা হয়েছে মধুসূদনের কবি প্রতিভা সম্পর্কে। এখানে প্রাবন্ধিক মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি বলে অভিহিত করে জানিয়েছেন — "মধুসূদনের মেঘনাদবধ বাঙ্গালার প্রথম মৌলিক মহাকাব্য — যাহার মধ্যে মহাকাব্যোচিত রসোৎকর্ষ পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়। শুধু প্রথম নহে, ইহাই বঙ্গ সাহিত্যর প্রধানতম মহাকাব্য।"[৩] মধুসূদনের কবি প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভমত —

> **মধুসূদনের পূর্বে বঙ্গ সাহিত্যে যে ধারা চলিতেছে, তাহাকে আমরা প্রতীচ্যের কাব্য বিচার অনুসারে classic বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাসিক কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে বঙ্গ সাহিত্যের পোপ বলা যাইতে পারে।... ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা বঙ্গসাহিত্যের ক্লাসিক প্রণালীর শেষ কবি বলিতে পারি। তাহার পরেই মধুসূদন আবির্ভূত হইয়া বঙ্গের কাব্য জগতে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহার পূর্ণ প্রদীপ্ত প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অভিনব ভাষালোক ও ভাবরশ্মিতে উচ্ছাসিত হইয়া বাঙ্গালার কাব্য লক্ষ্মী এক অনুপমা শ্রীধারণ করিল। এই নতুন ভাবধারাকে আমরা বঙ্গ সাহিত্যের Romantic School of Poetry বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।**[৪]

© Santiniketan Sahityapath

তিনি মধুসূদনকে কবিপ্রতিভার মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করেন — "তিনি নিরবিচ্ছিন্ন কবি, সংসারে ও সাহিত্যে উভয়তই তাঁহাকে আমরা শুধু কবিরূপেই দেখিতে পাই।"[৫]

বঙ্গাসাহিত্যে মধুসূদনের অবদান যেমন বিচিত্র তেমনি অভিনব। এখানে সমালোচক সুরেশচন্দ্র ঘোষ মধুসূদনের প্রতিটি কাব্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য, 'বীরাঙ্গানা' কাব্য, 'ব্রজাঙ্গানা' কাব্য, 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'র প্রসঙ্গা গুরুত্বলাভ করেছে। তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বীররস এবং করুণরসের ব্যবহারে মধুসূদনের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন। এই কাব্যে কবির ভাষা প্রসঙ্গোও বিশ্লেষণ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই কাব্যটি এক অভিনব ধারার জন্ম দিয়েছে। এ প্রসঙ্গো প্রাবন্ধিকের অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরই এক মন্তব্যে — "স্বদেশের প্রাচীন মহাকাব্য হইতে গ্রহণ করিয়া, স্বীয় অসামান্য কল্পনার বিচিত্র বর্ণরাগে তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়া, পরে প্রতীচীর কাব্যভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আনয়ন পূর্ব্বক সেই মানসী মূর্ত্তিকে মনের মতো করিয়া সাজাইয়াছিলেন।"[৬]

'মেঘনাদবধ' কাব্যের ছন্দ, শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির আলোচনা প্রসঙ্গো সুরেশচন্দ্র ঘোষ মিলটন, হোমারের সঙ্গো মধুসূদনের তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে মিলটনের প্যারাডাইস লস্টের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গো 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের বিস্তারিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রতি সমালোচকের আলোকপাত লক্ষ করা যায়। এই কাব্যের ছন্দ পরিকল্পনায় মধুসূদনের কৃতিত্ব যে কেবল কবি মধুসূদনের ক্ষেত্রেই নয় — বঙ্গাসাহিত্যের জন্যও এক মূল্যবান সম্পদ বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। এখানে 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ কাব্য বলে প্রাবন্ধিক অভিহিত করেছেন। তিনি এই কাব্যের চতুর্থ সর্গের করুণ রস ও কান্ত রসের অত্যাধিক প্রশংসা করেছেন। উপমা প্রয়োগের বিষয়ে কালিদাসের সঙ্গো মধুসূদনের তুলনা করেছেন সমালোচক। মধুসূদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গো সমালোচক একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করেছেন — সেটি হলো এই কাব্যের নাটকীয়তা। নাটকীয় গুণের বিকাশ হলো মহাকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, যা এই কাব্যের সীতা ও সরমার কথোপকথনে পাওয়া যায়।

'মহাকবি মধুসূদন' প্রবন্ধে সুরেশচন্দ্র ঘোষের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বিস্তারিত সমালোচনার পরেই সংক্ষেপে 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গানা', 'ব্রজাঙ্গানা' কাব্য এবং 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র আলোচনা স্থান পেয়েছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের আলোচনায় 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মতো সমালোচকের অত্যাধিক প্রশংসা লক্ষ করা যায় না। মধুসূদনের প্রতিভার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হওয়ায় এই কাব্য কিছু কিছু জায়গায় ত্রুটি রয়েছে বলে সমালোচক জানিয়েছেন। তাই এই কাব্যে রসের বিকাশ অপেক্ষা কবিত্বের বিকাশ বেশি লক্ষ করা যায়। আবার শব্দচয়নের ক্ষেত্রে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের কৃতিত্ব 'মেঘনাদবধ' কাব্যের তুলনায় অধিকতর বলে প্রাবন্ধিকের অভিমত। 'বীরাঙ্গানা' কাব্যের প্রসঙ্গোও ভূয়সী প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গো সমালোচকের মন্তব্য — "বীরাঙ্গানার এক একটি পত্র যেন এক একখানি জীবন্ত আলেখ্য। বঙ্গা-সাহিত্যের শিরায় শিরায় তিনি কি অভূতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন তাহা বীরাঙ্গানা পড়িলে হৃদয়ঙ্গাম করিতে বিলম্ব হয় না।... বীরাঙ্গানার ভাবতরঙ্গাময়ী ভঙ্গী ও ভাষা বঙ্গাসাহিত্যের পক্ষে যেন অভিনব মহাশক্তির বোধনসঙ্গীত।"[৭] এই কাব্যের মধুর রস, নাটকীয়তা, ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রতিভার চূড়ান্ত সাফল্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর এই প্রবন্ধে সুরেশচন্দ্র ঘোষ 'ব্রজাঙ্গানা' কাব্যেকে বলেছেন কৃষ্ণ বিরহিণী রাধার করুণ বিলাপবাণী। তবে 'ব্রজাঙ্গানা'র রাধার বিরহ যে মানবী রাধার ক্রমবিকাশ এ প্রসঙ্গোরও উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গো আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন বৈষ্ণব প্লাবিত বঙ্গাদেশের কবি মধুসূদন যে এমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতেই কৃষ্ণকথা বলবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই 'ব্রজাঙ্গানা' কাব্যে ধর্মান্তরিত কবির এই সাফল্য এসেছে।

মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'র আলোচনা বেশ কিছুটা বিস্তারিত ভাবেই স্থান পেয়েছে 'মহাকবি মধুসূদন' প্রবন্ধে। কারণ প্রাবন্ধিক সুরেশচন্দ্র ঘোষ মনে করেন মধুসূদনের সর্বমুখী প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির দৃষ্টান্ত যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সেগুলির বিষয়ে সমালোচকের নিজস্ব বিশ্লেষণও পাওয়া যায়। সর্বোপরি এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রাবন্ধিক আরো একবার মধুসূদনের প্রতিভা বঙ্গাসাহিত্যের জন্য কতটা মূল্যবান সম্পদ সে

© Santiniketan Sahityapath

কথা উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের প্রতিভা বঙ্গাসাহিত্যে এক বিস্ময় — তিনিই এনেছিলেন বঙ্গাসাহিত্যের জন্য অভিনব সুর ও ছন্দ যা পরবর্তী কালের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক মাত্র ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। তাই এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের প্রধান উপলব্ধি মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যের যথার্থ মহাকবি, একথা বলা যায়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'মধুসূদন' (ভাদ্র ১৩৬০) এবং মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের 'কবি শ্রীমধুসূদন' (মাঘ ১৩৬০) এই দুটি প্রবন্ধ মোটামুটি একই সময়ের রচনা। এগুলিতে সংক্ষিপ্ত আকারে কবি মধুসূদনের প্রসঙ্গো আলোচনা রয়েছে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে কবি মধুসূদনের অবদানের কথা বলতে গিয়ে মধুসূদন প্রসঙ্গো বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন — "প্রতিকূল অবস্থায় যিনি জাতীয় সাহিত্যে নেতৃস্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেইরূপ লোক ছিলেন। প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে তিনি তাঁহার জাতির প্রতীক ছিলেন।... মধুসূদনে সংস্কৃতির সহিত শক্তির সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি যেমন ধীশক্তিতে তাঁহার দেশবাসীর প্রতিনিধি ছিলেন, তেমনি পরিপূর্ণ মানসিক সংস্কৃতিতে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।"[৮] কবি মধুসূদনের প্রসঙ্গো হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের এই প্রবন্ধে আমরা কোনো কাব্যগ্রন্থের বিষয়ে আলোচনা পাচ্ছি না, বরং তিনি কবি মধুসূদনের কবিমানসের বিষয়েই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যেহেতু মধুসূদন কেবল ইংরেজি, বাংলা নয়; ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান প্রভৃতি নব্য ইউরোপিয়ান ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করেছিলেন এবং তার দ্বারা নিজের সাহিত্যকে তথা কবিমানসকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি স্বদেশ ও স্বজাতির মননকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছেন। মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার যথার্থ সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। সেই প্রতিভা ছিল বলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের মহাকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সমালোচকের এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এছাড়াও তাঁর বিশ্লেষণে আর একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক উঠে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন — "ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য কেবল সংস্কৃতানুসারী হইবে না — কখনই সর্ব্বতোভাবে য়ুরোপীয় হইবে না। ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাবে — ভারতীয় ভাষায় — ভারতীয় চিন্তায় য়ুরোপীয় ভাব ও তেজ, মত ও রুচি স্থান লাভ করিবে। মধুসূদনের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যসমূহে ভবিষ্যতের সেই সাহিত্য-সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"[৯] তাই কবি মধুসূদন ও তাঁর সাহিত্য বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতির মতোই স্মরণীয় হয়ে আছেন। এখানে প্রাবন্ধিক হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ মধুসূদনকে কেবল প্রাচ্যের মহাকবিদের সঙ্গেই নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমার, দান্তে, মিলটনের মহাক্যাবিক প্রতিভার সঙ্গোও তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়াস করেছেন। মধুসূদনের সাহিত্য সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের এই মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক সংযোজন।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি যেমন স্মরণীয় হয়ে আছেন, মহাকবি মধুসূদনের কবি প্রতিভাও শাশ্বতকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হেমেন্দ্রকুমার ঘোষের 'মধুসূদন' প্রবন্ধে এমন কথা শোনা যায়। আর এর ঠিক বিপরীত সুর শোনা যায় মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের 'কবি শ্রীমধুসূদন' (মাঘ ১৩৬০) প্রবন্ধে। এখানেও প্রাবন্ধিক বলেছেন উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁস যুগে কবি মধুসূদন অনন্য এক প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মননের তিনিই স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। আর মধুসূদনের এহেন প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাবন্ধিক 'মেঘনাদবধ' কাব্য এবং 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র প্রসঙ্গা উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধে মতিলালবাবু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের কৃতিত্বের দিকগুলি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মধুসূদনের সাহিত্যের কোনো বিশ্লেষণ ভিত্তিক আলোচনা এই প্রবন্ধে নেই। কেবল সূত্রাকারে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক। এর পরেও বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে কবি মধুসূদন বিস্মৃত — এমন আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে প্রাবন্ধিকের কণ্ঠে। মধুসূদনের প্রতিভার মধ্যে যথেষ্ট উপাদান থাকার পরেও তাঁর সাহিত্যের চর্চা, মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যে সেভাবে হয় নি বলে সমালোচকের অভিমত।

এই প্রবন্ধের রচনাকাল মধুসূদনের জন্মের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে। বস্তুত প্রাবন্ধিকের এই অভিমতের সঙ্গো আমরাও একমত হয়ে বলতে পারি এই দাবি যথার্থ। কারণ প্রকৃত অর্থে কবি মধুসূদনচর্চা শুরুই হয়ছে তার পরবর্তী কালে। মধুসূদন যে নতুন কিছু করেছিলেন তা সমকালকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে তিনিও 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ছাড়া কোনো সম্পূর্ণ

© Santiniketan Sahityapath

ও বিস্তৃত আলোচনা করেন নি । রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে যিনি আধুনিক সাহিত্য বিচারের পদ্ধতিতে কবি মধুসূদন ও তাঁর সৃষ্টির বিশ্লেষণ করলেন তিনি শশাঙ্কমোহন সেন তাঁর 'মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' গ্রন্থে ১৯২৩ সালে। এর পরবর্তীকালে কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৯৪৭), প্রমথনাথ বিশীর 'চিত্র-চরিত্র' (১৯৪৯), শিশিরকুমার দাসের 'মধুসূদনের কবিমানস' (১৯৫৯) প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি।

৩

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু করেছিলেন নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। নাট্যকার মধুসূদনের নাটক রচনার সময়কাল ছিল ১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র চার বছর। এই সময়কালে তিনটি পূর্ণাঙ্গ সিরিয়াস নাটক এবং দুটি প্রহসন লিখেছেন। এছাড়াও ১৮৭৩ সালে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পেশাদারি নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য লিখেছিলেন 'মায়াকানন' নাটকটি অর্থাৎ সব মিলিয়ে সাতটি নাটক পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে নাটক সৃষ্টির প্রচলিত রীতিকে ভেঙে দিয়ে অন্তর্ঘাতী প্রতিভায় আধুনিকতার নিজস্ব রীতি তৈরি করলেন। সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় — "ইহা সত্য যে, তাঁহার কোনো নাটকই মেঘনাদবধ বা বীরাঙ্গনা কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি আধুনিক বাংলা নাটকের জনক এবং তাঁহার পরে নাট্যসাহিত্য খুব বেশী অগ্রসর হয় নাই।"[১০] সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের অবদান অস্বীকার করবার নয়। তাই নাট্যকার মধুসূদনের আলোচনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

'মাসিক বসুমতী'তে নাট্যকার মধুসূদন বিষয়ক একটি মাত্র প্রবন্ধ রয়েছে — নমিতা সেনের 'মধুসূদনের প্রহসন', প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ। মধুসূদন কেবল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন তা নয়, দুটি প্রহসনও লিখেছিলেন — এই প্রবন্ধে নমিতা সেন তাঁর দুটি প্রহসনের বিষয়েই আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দী' প্রবন্ধের হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যটি — "তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য; তাঁহার ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভার বিকাশ হয় তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহ মধ্যে মহামান্য হয়।"[১১] মধুসূদনের প্রহসন সম্পর্কে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

মধুসূদনের এই দুটি প্রহসন রচনার কারণ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক নমিতা সেন প্রথমেই আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন —

> **বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার পর মধুসূদন পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে ১৮৬০ সালে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুটি রচনা করেন। অলীক কুনাট্য রাঢ় বঙ্গের আপামর দর্শকের তুষ্টি মধুসূদনের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। তাই বিদেশী ভাব ও শৈলীর আমদানি করে তিনি নতুন পথ দেখাবার দুঃসাহস নিয়ে শর্মিষ্ঠা রচনা করেছিলেন এবং বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে শর্মিষ্ঠার অভিনয় সাফল্য তাঁকে খুবই উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু প্রহসনের ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের সাড়া জাগে নি ততটা। প্রাচীনপন্থী এবং ইয়ং বেঙ্গালের ব্যঙ্গচিত্র সমকালের সমাজ সহ্য করে নি। পাইকপাড়ার রাজারা তাই অভিনয় বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।**[১২]

অর্থাৎ বাংলা নাটকের ইতিহাসে পাশ্চাত্য রীতিতে লেখা রীতিমতো ফার্স বা প্রহসন নাটকের যথার্থ সূত্রপাত মধুসূদনের এই দুটি প্রহসনের মধ্য দিয়েই। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র থেকে শুরু করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের হাতে যে প্রহসনের ধারাটি সমৃদ্ধ হয়েছে তার সূত্রপাত মধুসূদনের হতেই হয়েছিল। কিন্তু অভিনীত হলো না। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের ক্ষোভের কথা প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রহসন দুটি পরবর্তীকালের সমালোচকেরা এতো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলে মনে করলেও মধুসূদন নিজে হয়তো তাঁর প্রহসন রচনার বিষয়ে এতটা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। প্রাবন্ধিকের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একটি বিষয়ের কথা এখানে আমরা বলতে পারি, আসলে আদর্শ প্রহসনের ভাব ও

ভাষা ছিল মধুসূদনের বিশুদ্ধ সাহিত্যাকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। প্রহসনের প্রতি মধুসূদনের এই অনীহা কেবল ব্যক্তিগত অভিরুচির কারণেই নয়, এই নাট্য-সংরূপকে তিনি জাতীয় রুচির জন্য ক্ষতিকর বলেও মনে করেন। এ প্রসঙ্গো রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করতে পারি — "As a scribbler, I am of course proud to think that you like my Farce, but to tell you the candid truth, I half regret having publish those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farce."[১৩] প্রাবন্ধিকও এই চিঠির উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও মধুসূদনের প্রহসনের আলোচনা প্রসঙ্গো স্বয়ং মধুসূদনের এই বক্তব্যটির উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। সুতরাং এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নমিতা সেন মধুসূদনের দুটি প্রহসনের সমালোচনার পাশাপাশি প্রহসন বিষয়ে তাঁর মনোভাবের কথাও তুলে ধরতে চেয়েছেন, যা প্রবন্ধটির অন্যতম কৃতিত্বের দিক।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন প্রাচীন হিন্দু সমাজকে বিদ্রূপ করে লেখা হয়েছিল 'বুড় সালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি। এ প্রসঙ্গো তিনি এই প্রহসনের ভক্তপ্রসাদ, আনন্দ, হানিফ, বাচস্পতি, গদাধর প্রভৃতি চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হানিফ ও ফতেমার চরিত্র নির্মাণে মুসলমান সমাজের নিখুঁত ছবি মধুসূদন এঁকেছেন বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। এ প্রসঙ্গো চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদনের সঙ্গো দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত একটি তুলনামূলক সমালোচনা পাওয়া যায়। এই সমালোচনায় প্রাবন্ধিক নমিতা সেন মধুসূদনকেই সমাজের সকল শ্রেণির চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এছাড়াও প্রাবন্ধিক এই আলোচনায় মধুসূদনের প্রহসনের অশ্লীলতার অভিযোগ প্রসঙ্গো মন্তব্য করেছেন — "অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে দীনবন্ধু বা মধুসূদন কেউই রেহাই পান নি।"[১৪] আর 'বুড় সালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের বিপরীত ভাবনার কাহিনি রয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় — সেকালের ইয়ং বেঙ্গাল সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবনযাপন ও অধোগতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এই প্রহসনে। এই প্রহসনে যে সমাজকে মধুসূদন দেখাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রাবন্ধিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি —

> **মধুসূদন এই সমাজের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা — শুধু দ্রষ্টা মাত্রই নয় তার আদর্শ প্রতীকও। মনে হয় এই প্রহসনে মধুসূদন যেন আত্মবিশ্লেষণে ব্যাপৃত। যে ইয়ং বেঙ্গালের সংস্কারে তিনি আবাল্য লালিত হয়েছিলেন পরিণত বয়সে তারই অসঙ্গাতি তাঁকে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই ইয়ং বেঙ্গাল অভিধেয় সমাজকে সচেতন করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রশ্ন চিহ্ন তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন।**[১৫]

অর্থাৎ প্রাবন্ধিকের মতে সমকালীন শিক্ষিত নব্যবাবুদের নীতি ও নৈতিকতাহীন স্বেচ্ছাচার ও বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন এই প্রহসনের অন্যতম উদ্দেশ্য তেমনি মধুসূদনের মতো উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবকদের আত্মসমালোচনাও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য। আর এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাবন্ধিক এই প্রহসনের কালীনাথ ও নববাবু চরিত্রের আলোচনা করেছেন। তবে প্রাবন্ধিকের মতে এই চরিত্রগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে শেক্সপিয়র, বেন জনসনের দ্বারা মধুসূদন প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। এই ধরনের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকারের ত্রুটির দিকগুলি বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক বলেছেন — "মানব চরিত্রের বিরাট রহস্য, তার দুর্জ্ঞেয়তা, তার দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রতি তিনি নাট্যকারের স্বাভাবসিদ্ধ-নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গী নিয়ে তাকাতে পারেন নি। এর ফলে, তাঁর ব্যঙ্গ নাটক শুধু caricature-ই হয়েছে, উচ্চাঙ্গোর প্রহসন হতে পারে নি।"[১৬] এখানে তিনি এই ত্রুটির আলোচনা প্রসঙ্গো মধুসূদনের নববাবুর চরিত্রের সঙ্গো দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের নিমে দত্ত চরিত্রের তুলনা করে প্রাবন্ধিক নমিতা সেন মধুসূদনের চরিত্রকে অনেকখানি ম্লান দেখিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে মধুসূদনের দুটি প্রহসনের সমালোচনা করতে গিয়ে যেমন প্রহসনকার মধুসূদনের প্রশংসা করেছেন, তেমনি এ বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকগুলিও আলোচনা করেছেন। এছাড়াও মধুসূদন পরবর্তী বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে এই দুটি প্রহসনের প্রভাব যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। সর্বোপরি ত্রুটি বিচ্যুতির পরেও তিনি এবিষয়ে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করে স্বীকার করেছেন — "In this civilization, is the best [farce] in the language."[১৭]

© Santiniketan Sahityapath

মধুসূদনের প্রহসন বিষয়ক নমিতা সেনের প্রবন্ধটির আলোচনা সূত্রে আমরা মধুসূদনের প্রহসন বিষয়ক কয়েকটি রচনার উল্লেখ করতে পারি। যেমন, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'মধুসূদন: কবি ও নাট্যকার' (১৯৫৬) গ্রন্থের 'মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা: প্রহসন সৃষ্টিতে' অধ্যায়; 'মধুসূদন: সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব' গ্রন্থে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের 'মধুসূদনের নাট্যচিন্তা ও নাট্যাদর্শ' প্রবন্ধ (১৯৫৬); ক্ষেত্র গুপ্তের 'নাট্যকার মধুসূদন' (১৯৬২) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় (মধুসূদনের প্রহসন বিষয়ক আলোচনা রয়েছে); আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' (১৯৬৮) গ্রন্থের 'সামাজিক প্রহসন' অধ্যায়। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুটি একই সময়ের। এই লেখা দুটির পরবর্তীকালের সমালোচনা নমিতা সেনের প্রবন্ধটি। লেখাদুটির সঙ্গে নমিতা সেনের প্রবন্ধের ব্যবধান প্রায় সাত বছরের। দুর্গাশঙ্করবাবু তাঁর প্রবন্ধে মধুসূদনের পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কিন্তু প্রহসনের বিষয়ে আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কারণ তাঁর অভিমতটি হলো মধুসূদনের নাট্যচর্চায় অন্য নাটকগুলি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, প্রহসনগুলির গুরুত্ব তার থেকে কম। এ প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি —

> **মোট কথা ফার্স, কমেডি ও ট্রাজেডি এই তিন শ্রেণীর নাটক রচনা করলেও জীবনের ট্র্যাজিক-সুরকে নাট্যে ধ্বনিত করে তোলার দিকে তাঁর প্রাণের একটা প্রচ্ছন্ন কামনা ছিল।... গ্রীক অদৃষ্টবাদের সূত্রেই মধুসূদনের নাট্যরচনায় এই ট্রাজিক সুরের অভ্যাগম। আর এ সুরও তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনেরও মর্মগত গীত। ব্যতিক্রম শুধু বলছি ফার্স দুটিতে। জীবনের লঘু-চপল দিকটিকে স্বতন্ত্রভাবে কোনো নাটকে রূপায়িত করতে তিনি প্রবল উৎসাহ — বোধ করেন নি — বরং এই কথাই মনে করতেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিতে ট্রাজিক সুরের সঙ্গে কমিক-সুরের মিশ্রণ থাকে — The most beautiful Plays in the world are combination of Tragedy and comedy (কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি)।**[১৮]

তিনি মধুসূদনের চিঠিপত্রের প্রেক্ষাপটে তাঁর নাট্যচিন্তার দিকগুলি আলোচনা করেছেন। 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত নমিতা সেনের প্রবন্ধেও আমরা দেখেছি যে তিনিও মধুসূদনের প্রহসনের আলোচনায় চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তিনি দুর্গাশঙ্করবাবুর পরে এই প্রবন্ধ লিখেছেন, তাই তাঁর আলোচনায় দুর্গাশঙ্করবাবুর প্রভাব থাকতে পারে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে নমিতা সেনের প্রবন্ধটি সত্তরের দশকের আলোচনা। তাই এখানে প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণ আরো গভীরতা পেয়েছে একথা আমরা প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে বলতে পারি।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের গ্রন্থে মধুসূদনের দুটি প্রহসনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। তিনি মূলত প্রহসনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনাক্রমে মধুসূদনের প্রহসনের সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে নমিতা সেন তাঁর প্রবন্ধে ঠিক এর বিপরীত রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। সর্বোপরি সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত দুটি প্রহসনের মধ্যে 'বুড় সালিখের ঘাড়ে রোঁ'কে মধুসূদনের তথা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলে অভিহিত করেছেন। 'মাসিক বসুমতী'র আলোচনায় দুটি প্রহসনকেই প্রাবন্ধিক উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেছেন।

ক্ষেত্র গুপ্তের 'নাট্যকার মধুসূদন' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে, আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের 'সামাজিক প্রহসন' অধ্যায়ে বিস্তারিত আকারে মধুসূদনের প্রহসন বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ক্ষেত্র গুপ্তের আলোচনা 'মাসিক বসুমতী'র মধুসূদনের প্রহসন বিষয়ক নমিতা সেনের প্রবন্ধের এক বছর আগে, আর আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা তার বছর পাঁচেক পরে। এই দুটি গ্রন্থের আলোচনাই অত্যন্ত গভীর — সেখানে যেমন প্রহসন কাহিনির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে তেমনি তার গঠনরীতি, চরিত্র বর্ণনা, সমাজচিত্র প্রভৃতি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মধুসূদনের প্রহসনে ফরাসি প্রভাবের কথা বলেছেন। ক্ষেত্র গুপ্তের 'নাট্যকার মধুসূদন' গ্রন্থে এই বিষয়ে সর্বাধিক বিস্তৃত আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি এখানে প্রহসন সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আলোচনার পরেই মধুসূদনের প্রহসনের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। তিনি এই প্রহসনগুলিকে মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যকীর্তির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তিনিও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র গঠনরীতির ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্ত এবং নমিতা সেন সহমত পোষণ করেছেন বলা যায়।

'মাসিক বসুমতী'তে মধুসূদনের প্রহসন বিষয়ক নমিতা সেনের প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৩৭০ বঙ্গাব্দ। এই প্রবন্ধের আলোচনাকালে আমরা এই বিষয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের সমালোচনাগুলির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি

© Santiniketan Sahityapath

নাট্যকার মধুসূদন বিষয়ক মূল্যবান সব গ্রন্থভুক্ত। তাই নাট্যকার মধুসূদনের আলোচনার সূত্রে বলতে পারি 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত নমিতা সেনের মধুসূদনের প্রহসন বিষয়ক প্রবন্ধটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রবন্ধটিও প্রথম পর্বের মধুসূদন সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলির সমসাময়িক কালেই রচিত। সর্বোপরি, এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে মধুসূদনের প্রহসনের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সমালোচনা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাই বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার মধুসূদন তথা প্রহসনকার মধুসূদনের আলোচনায় প্রবন্ধটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

৪

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সঞ্চার করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য হলো রেনেসাঁসের যুগ। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি নব ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু কলেজের ইংরাজি-শিক্ষিত নবযুবা ইয়ং বেঙ্গালের দল প্রচলিত সব কিছু সংস্কার এবং হিন্দুধর্মের সনাতন আদর্শকে ভেঙে ফেলে পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুকরণে উচ্ছৃঙ্খল মদোন্মত্ত রক্তিম ফেনিল অপসভ্যতায় মেতে উঠেছিল। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতিকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৎপর হয়েছেন। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে বাঙালি-জীবন যখন উদ্‌ভ্রান্ত তখন সেই যুগসন্ধির কালেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে তাঁর সমসাময়িক যুগমানসের সমস্ত অবচেতনার অপ্রকাশিত অথচ প্রকাশোন্মুখ অস্থিরতা প্রতিভার দ্বারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবৃত করলেন এবং তার প্রকাশের জন্য ছন্দ, রীতি, প্রকাশভঙ্গিতে যতটা অভিনবত্বের প্রয়োজন, নিপুণ সংগ্রাহকের মতো তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাহিত্যাদর্শ থেকে তা সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকে এক সম্পূর্ণতা দিলেন। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন যুগান্তর। এ প্রসঙ্গে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটির উল্লেখ করতে পারি — "নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি সেই নবপ্রভাতে উদ্বেলিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলা পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করল না।... বাংলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতার দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"[১৯]

মধুসূদনের সাহিত্যে এই আধুনিকতার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত মঞ্জু মিত্রের 'মাইকেল মধুসূদনের কাব্য বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে (শ্রাবণ ১৩৬১)। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচক প্রথমেই জানিয়েছেন যে মধুসূদনের সাহিত্য হলো তাঁর প্রতিভা এবং যুগমানসের প্রতিফলন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এ প্রসঙ্গে —

> **মধুসূদনের স্বল্পপরিসর কাব্য-জীবনের কাব্যসৌধের মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দার্শনিক মতবাদ নেই। কেবলমাত্র শিল্পসাধনার চরমোৎকর্ষ এবং জীবনবাদের তীব্রতা তাঁর কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাবশালী এবং অমর করেছে।... মধুসূদনের কাব্যের যদি কোনো বিশেষ ধর্ম বা দর্শন থাকে তবে তা মানবধর্ম — মধুসূদন একান্ত ভাবে জীবনবাদের কবি, মানবতার আদর্শেই তাঁর কাব্যের চরিত্র বিচার্য্য।**[২০]

তাঁর সুস্পষ্ট ভাবনা — এই জন্যই মধুসূদনের সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রচলিত ঘটনার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন লক্ষ করা যায়। আর এই যুগচেতনার প্রভাবেই তাঁর কাব্যে তিনি মানবতার জয়গান করেছেন।

এই প্রবন্ধে মঞ্জু মিত্র মধুসূদনের কাব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তাঁর কবি প্রতিভায় শিল্পের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি সর্বদা উজ্জ্বল ছিল। একটা সামান্য সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে যে উপমার সমাবেশ তিনি করেছেন তা কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টিই করে নি, তার মধ্যে একটা epical grandeur প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবি প্রতিভায় এই শিল্পিত দক্ষতা ছিল বলেই 'ব্রজাঙ্গনা 'কাব্যের সৃষ্টি করেছেন। প্রাবন্ধিকের পর্যবেক্ষণ, বৈষ্ণব দর্শন নয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীরাধার রূপটিই মধুসূদনকে এই কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই এই কাব্যে মধুসূদন মানবী রাধার চিত্রই এঁকেছেন। প্রাবন্ধিকের অভিমত, মধুসূদনের এই ভাবনা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবজাত। এই দিকটি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে প্রাবন্ধিক বলেছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি মধুসূদনের পাণ্ডিত্যই তাঁকে দিয়েছিল সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি যা তিনি দান করেছেন উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যকে।

© Santiniketan Sahityapath

মধুসূদনের সাহিত্যে আধুনিকতার প্রসঙ্গে এখানে প্রাবন্ধিক মূলত তিনটি কাব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যেমন — 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মধুসূদনের সময়কালের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আধুনিকতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মনে পাপ, পুণ্যের, নীতি, সতীত্ব, ধর্ম, সংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলির সম্পর্কে যুগমানসের ভাবনার বিবর্তনকে মধুসূদন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকের মতই মধুসূদন তাঁর কাব্যে চরিত্রগুলির মধ্যে সমাজমানসের এই অবচেতনার বিদ্রোহ সুকৌশলে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলেন। এই দিক দিয়েই তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী কাব্য হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক 'বীরাঙ্গনা'কে, 'মেঘনাদবধ' কাব্য অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বেদনা ও বিশ্লেষণের সুর, বাচনভঙ্গির অভিনবত্ব সব দিক থেকেই 'বীরাঙ্গনা'য় মধুসূদনের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংল সাহিত্যে মধুসুদনের অভিনব অবদানগুলির মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ জীবনবাদকে প্রাবন্ধিক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন যা আসলে মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন বলে প্রাবন্ধিকের অভিমত। তবে মহাকাব্য রচয়িতা মধুসূদনকে কোনো মৌলিক কৃতিত্বের অধিকারী বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন নি। কারণ তিনি মনে করেন মধুসুদনের প্রতিভার এর থেকেও বড়ো অবদানটি হলো —

> **প্রকৃত পক্ষে মাইকেল তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে শিল্পকৌশলের যে কয়েকটি অভিনব আদর্শ সাহিত্যকে দান করে গেলেন, তারই অনুসরণে গঠিত হয়ে উঠেছে নব্য বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, সনেটের প্রবর্তন — এ সকল ক্ষেত্রে মধুসূদনের কীর্তি অমর। বিবর্তনের সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যে যে অমিল ও সমিল অমিত্র ছন্দ এবং সনেটের রূপ আমরা পাই তার পথদ্রষ্টা যে মধুসূদন দত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।**[২১]

সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেটের প্রবর্তক হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের সর্বাধিক অবদান বলে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য। সবশেষে তিনি আরো একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন সেটি হলো প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন — বাংলা আধুনিক সাহিত্যে এক বলিষ্ঠ মানবিকতার মানদণ্ডে আমরা জীবনকে বিশ্লেষণ করতে শিখেছি; আর তার উৎস মধুসূদনের সাহিত্য। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রসঙ্গ টেনেছেন। সর্বোপরি এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের চরম উপলব্ধি এই যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও পরিণতির ক্ষেত্রে মধুসূদনের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। আর তাই আমরা বিহারীলালকে যেমন বাংলা গীতিকবিতার গুরু বলে স্বীকার করি, তেমনি আধুনিক বাংলা কাব্যের শিল্পসৌষ্ঠবের উৎকর্ষে ও অভিনব চিন্তাধারার বিচারে মধুসূদনের স্থানও নতুন করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

এতক্ষণ ধরে আমরা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত মঞ্জু মিত্রের 'মাইকেল মধুসূদনের কাব্য বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধের আলোচনায় দেখলাম মধুসূদনের সাহিত্যের আধুনিকতার দিকগুলি, বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনাগুলি কোনো কোনো দিক থেকে অভিনবত্বের সঞ্চার করেছে। মঞ্জু মিত্রের এই লেখার আলোচনসূত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা' (১৯৮৩) গ্রন্থের অন্তর্গত 'মধুসূদন ও আধুনিকতা' নামক প্রবন্ধটি। 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত মঞ্জু দেবীর প্রবন্ধের প্রায় ২৯ বছর পরে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই লেখায় ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই জানিয়েছেন — "মধুসূদনের চিত্ততলশায়ী নবযুগ রক্তশতদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।... কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির সমগ্র সত্তাকে বুঝি মধুসূদনের মতো আর কেউ Sturm and strange ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করতে পারে নি। উনিশ-বিশ শতকের কোনো ভারতীয় কবিই একক চেষ্টায় এই ধরনের সার্বিক চিত্ত সংস্কারের পথ প্রস্তুত করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।"[২২] মধুসূদন সংস্কৃত শিখে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও তাঁর মনোভঙ্গি পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। তা-ই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রবণতাকে তৈরি করে দিয়েছিল — নিয়ে এসেছিল আধুনিকতা। এই আধুনিকতার অন্যতম তিনটি লক্ষণের কথা অসিতবাবু উল্লেখ করেছেন। যেমন — বিদ্রোহ, আধুনিকত্ব এবং বিশ্ব-মানবিকতা। মধুসূদনের সাহিত্যে এই আধুনিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই যে মধুসূদনের এই অভিনবত্বের সবটুকু যেমন তাঁর রচনার নিখুঁত শিল্পকর্ম হতে পারে নি, তেমনি

© Santiniketan Sahityapath

তাঁর এই প্রচণ্ড শক্তি ও passionকে উনিশ শতকের বাঙালি জীবন যথার্থ ভাবে গ্রহণ করতেও পারে নি। মধুসূদনের সাহিত্যের অভিনবত্বের অন্যতম একটি দিক হলো গ্রিক সাহিত্যের প্রভাব। এ প্রসঙ্গো অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি আমরা উল্লেখ করতে পারি — "গ্রীক অদৃষ্টবাদ ও ভারতীয় কর্মবাদ — এই আপাত বিরোধী মনোভাবের মধ্যে মাইকেলের মানসিক ভারসাম্য আন্দোলিত হয়েছে। ফলে সমগ্র কাব্যের মূল পরিকল্পনার মধ্যে দ্বৈততা সৃষ্টি করেছে। এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর অন্তর্দ্বন্দ্বকেই পরিস্ফুট করেছে। এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয়ই উনিশ শতকের আধুনিকতাকে শিল্পে-সাহিত্যে ত্বরান্বিত করেছিল।"[২৩]

মধুসূদনের সাহিত্যের আধুনিকতার আলোচনা প্রসঙ্গো সমালোচক মঞ্জু মিত্র এবং সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন। দুটি প্রবন্ধের রচনাকালের ব্যবধান প্রায় তিরিশ বছরের। তাই সময়কালের পার্থক্যে সমালোচনার অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। মঞ্জু দেবী মধুসূদনের সাহিত্যের আধুনিকতার দিকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে ধরেছেন এবং তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু অসিতবাবু আধুনিকতার লক্ষণগুলি এতো বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তিনি মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের দিকটিকেই বেশি জোর দিয়ে সমালোচনা করেছেন। দুটি প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা বলতে পারি মধুসূদনের সাহিত্যের আধুনিকতার প্রসঙ্গো এই দুটি প্রবন্ধই গুরুত্বপূর্ণ। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটির রচনাকাল বিশ শতকের আশির দশকের। তাই সমালোচনা যেমন গাম্ভীর্যপূর্ণ তেমনি মূল্যবান। তবে 'মাসিক বসুমতী'র এই বিষয়ক সমালোচনাটি অসিতবাবুর গ্রন্থের তিরিশ বছর আগের হলেও আলোচনা প্রসঙ্গো আমরা দেখেছি প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণের গভীরতা। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গো তিনি মধুসূদনের সাহিত্যের অভিনবত্বের দিকগুলির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৫

হিন্দু কলেজে পড়ার সময় মধুসূদন নারী শিক্ষা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এখানে তাঁর নারী ভাবনার প্রাথমিক রূপটি পাওয়া যায় —

> **In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is very great, for unless they are enlightened, they spread infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is women who first gives ideas to the future philosopher and the would-be-poet.**[২৪]

এই প্রবন্ধের শেষে প্রাচ্য দেশের নারী জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের বিষয়ে মধুসূদনের আপত্তি লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষিতেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি নারী সম্পর্কে মধুসূদনের বিশিষ্ট ধারণা। তাঁর সাহিত্যে আমরা দেখি তিনি কখনো প্রতিনায়ককে নায়ক করে তুলছেন তেমনি প্রচলিত নারী চরিত্রের জননী ও স্ত্রীরূপকে অতিক্রম করে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত করেছেন। মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি হলো ইংরেজিতে লেখা The Captive Ladie (1849), যা তিনি মাদ্রাজে অবস্থানকালে লিখেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে পুরুষ শাসনাধীনে বন্দিনী নারীর জীবন কাহিনি ও মনন মধুসূদনকে বার বার নাড়া দিয়েছে আর তারই প্রকাশ তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যে বিভিন্ন নারী চরিত্রের অভিনবত্বের দিকগুলিতে — এই প্রেক্ষিতেই মধুসূদনের নারীচরিত্ররা সংসারে ও সমাজে হয়ে উঠেছে বীরাঙ্গানা।

"মধুসূদন ছিলেন বিধর্মী — চিরবিদ্রোহী, তবুও বাঙ্গালা মায়েরই এক দুরন্ত অশান্ত সন্তান। বঙ্গাজননীর এই বিদ্রোহী সন্তান বিদেশী সাহিত্য হইতে মূল ঘটনা, ভাব, কল্পনা, বর্ণনাভঙ্গি, ছন্দ, আদর্শ ইত্যাদি আহরণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যকেই নূতন রূপসজ্জায় ভূষিত করিয়াছিলেন এবং আপন সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও মহিমায়... আত্মহারা কবি স্বদেশী ও বিদেশীয় সুরে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা গাহিয়াছিলেন।... ভারতবর্ষ মাতৃপূজক, তাই ভারতের কবি চিরদিনই নারীর প্রশস্তি গাহিয়াছেন বিচিত্র সুরে। মধুসূদনের নৈপুণ্য ও কৃতিত্বও নারীর বিচিত্র রূপের মহিমা কীর্তন করিতেই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। তাই করুণ ও বিষাদের সুরে চারণ কবি বাঙ্গালার পুণ্য

© Santiniketan Sahityapath

প্রেমের নির্ঝরধারা, আনন্দ ও শক্তিরূপিণী চির ভাগ্য-বিড়ম্বিতা ক্রন্দসী নারীর জীবনগাথা অমর ছন্দে গাহিয়াছেন। নারীকে তিনি কত বিচিত্র রূপেই না তাঁহার ধ্যান-কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।”[২৫] — মধুসূদনের সাহিত্যের নারী প্রসঙ্গে লীনা মিত্র এমন মন্তব্য করেছেন 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'মধুসূদনের কবি কল্পনায় নারী' প্রবন্ধে। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবেই প্রাবন্ধিক এই বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন। করুণ রসের প্রতি কবির চির আকর্ষণ, মায়ের সঙ্গে চির বিচ্ছেদ বেদনা, চির নির্যাতিত বঙ্গনারীর বেদনাময়ী অপরূপ সৌন্দর্য, পতিপ্রেম, তেজস্বিতা, পবিত্রতাই মধুসূদনের নারী ভাবনার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

মধুসূদনের নারী চরিত্রের বিচার করে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য, তাঁর নারী চরিত্রগুলি হলো বাংলার একান্ত নিজস্ব বাঙালি নারীর আদর্শে পরিকল্পিত। বাঙালি সমাজে যে সব নারীরা আদি কাল থেকে আদর্শস্থানীয়, শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরাই মধুসূদনের কবিকল্পনায় নারী চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন — “তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শগত ও চরিত্রগত অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও সামঞ্জস্য আছে এবং তাহা শিল্পী কবির স্বহস্তের রূপচর্চায় ও নিজস্ব ভাবাদর্শে অভিনব হইয়াছে।”[২৬] এই মন্তব্য প্রাবন্ধিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

মধুসূদনের সাহিত্যে নারী চরিত্রের এই প্রাথমিক মূল্যায়নের পরে সমালোচক লীনা মিত্র কবি মধুসূদনের প্রতিটি রচনার উল্লেখ করে সেখানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রগুলির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই তিনি মধুসূদনের নাটকে চিত্রিত চরিত্রগুলির প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। মধুসূদনের রত্নাবলী চরিত্রে বাঙালি নারীর প্রভাব প্রাবন্ধিক লক্ষ করেছেন। শর্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী প্রসঙ্গে তাঁর অভিমতটি হলো সেখানে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও ভারতীয় প্রভাবই অনুসৃত হয়েছে। এই চরিত্রগুলির নির্মাণের পিছনে নাট্যকারের মনভঙ্গির ব্যাখ্যা করে প্রাবন্ধিক লীনা মিত্র বলেছেন — “নারীর ভাগ্যনিয়ন্তা অদৃষ্ট নামক বিরাট শক্তিমান পুরুষের হস্তে লাঞ্ছিত অসহায়া নারীর অশ্রুধারাসিক্ত রূপরাশিই ছিল মধুসূদনের ধ্যান-কল্পনায় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।... ঈশ্বরে এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস, এমন অপার ধৈর্যশীলতা, অদৃষ্টকে নির্বিচারে মানিয়া লইবার এমন দুশ্চর তপস্যা, গুরুজনে অটল ভক্তি, সুগভীর পাতিব্রত্য, প্রেম ও নির্ভরতা — এ বুঝি ভারতের হিন্দু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।”[২৭] এখানে সমালোচকের বিশ্লেষণী বুদ্ধি প্রাধান্য পেয়েছে।

এর পরবর্তীতে সমালোচক লীনা মিত্র মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত নারী চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই নাটকের তুলনায় মধুসূদনের কাব্যের নারী চরিত্রের আলোচনা এই প্রবন্ধে প্রকৃতিগত ভাবে যেমন গভীর তেমনি আকারেও বিস্তৃত। তিলোত্তমাকে মধুসূদনের সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন প্রাবন্ধিক। তিনি এই কাব্যে কবির সৌন্দর্য ভাবনার অপরিসীম প্রশংসা করেছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সীতা চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রেম ও পবিত্রতারগুণের কথা বলেছেন। এই আদর্শ নারী চরিত্রই পরবর্তী কালে ভারতীয় সমাজে নারীর পথ নির্দেশ করেছে বলে প্রাবন্ধিকের মূল্যায়ন। মন্দোদরী চরিত্রের আদর্শ মাতৃত্ব ও সম্রাজ্ঞীর লক্ষণ, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে মধুসূদনের মৌলিকতা, প্রমীলার মধ্যে কুলবধূর কোমলতা, সৌন্দর্য ও বীরাঙ্গনার তেজ প্রভৃতি গুণের প্রয়োগে মধুসূদনের অসম্ভব কৃতিত্বের প্রশংসায় অভিভূত হতে দেখা যায় প্রাবন্ধিক লীনা মিত্রকে। বীরাঙ্গনাকে অন্যগুলির থেকে স্বতন্ত্র এবং বাংলা কাব্যে মধুসূদনের মৌলিক অবদান বলেছেন। তিনি বলেছেন এই কাব্য মধুসূদন নারীকে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় যে যে রূপে দেখা সম্ভব, কবি তাঁর কল্পনায় সেই ছবি এঁকেছেন। কাব্যটিতে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও শিল্পকৌশল এবং কাব্যরস কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় নি। সর্বোপরি প্রাবন্ধিকের উপলব্ধি, এই কাব্যে মধুসূদনের প্রতিভার গাম্ভীর্য এবং বৈচিত্র্যময় কল্পনার অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা রয়েছে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রতিটি নারী চরিত্রই কোনো-না-কোনো দিক থেকে বিদ্রোহী, বীর্যবত্তা বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগের স্বর শোনা যায়; নিজের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে তারা প্রত্যেকেই সরব। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও সমাজে 'বীরাঙ্গনা'র মতো একটি কাব্য সৃষ্টি যেমন দুঃসাহসিক তেমনি অভিনব বিষয় ছিল। এই কাব্যে বিদ্রোহী মধুসূদন সব বন্ধন ভেঙ্গে ফেলে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লীনা মিত্রকে বলতে শোনা যায় যে এটি প্রেমিক কবির প্রেমরসসিক্ত হৃদয়ের সংগীত। ব্রজাঙ্গনার মানবী রাধা এমনই প্রেমিকা যিনি অশ্রুসিক্ত, বিরহ ব্যাকুল, দুঃখ, হতাশা ও ব্যর্থতাময় বাস্তব সংসার থেকেই আরাধিকায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

মধুসূদনের কবি কল্পনায় নারী প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি আলোচনা করবার প্রয়াস করেছেন। আলোচনা ক্রমে আমরা দেখেছি প্রাবন্ধিক মধুসূদনের বিভিন্ন সাহিত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্য ও নাটকের নারী চরিত্রগুলির বিস্তারিত আলোচনা এই সমালোচনায় উঠে এসেছে। প্রাবন্ধিক এই চরিত্রগুলির নির্মাণে মধুসূদনের দক্ষতা ও ব্যর্থতা দুটি দিকেরই সমালোচনা করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের দিকটি বেশি আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। সর্বোপরি, মধুসূদনের সাহিত্যের নারীদের অভিনবত্বের প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মন্তব্যটি স্মরণীয় — "আজ হইতে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে নারী প্রগতির যে অভাব শক্তিমান কবি মধুসূদন হৃদয়ের অদম্য সাহসের সহিত দিয়া গিয়াছেন — শত বৎসর পরে বাঙ্গালা সমাজে ও সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই প্রগতি সর্বক্ষেত্রে হয়ত কল্যাণকর হয় নাই, তবুও শুভ যে আনিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"[২৮]

৬

সুরেশচন্দ্র ঘোষের 'মহাকবি মধুসূদন' এবং হেমেন্দ্রকুমার ঘোষের 'ভাঙা অমিত্রাক্ষরের স্রষ্টা কে?'এই দুটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রসঙ্গে। 'মাসিক বসুমতী'তে ছন্দশিল্পী মধুসূদনের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টিতে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব। সমালোচকেরা বলেছেন, "মধুসূদন বঙ্গ-সাহিত্যে এই ছন্দের শুধু স্রষ্টা নহেন, তাঁহার রচনাই ইহার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।"[২৯] 'তিলোত্তমাসম্ভব' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য হলেও ওই ছন্দেকে গদ্যের সঙ্গে প্রথম ব্যবহার 'পদ্মাবতী' নাটকে। এই ছন্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অভিমত হলো, বাংলা সাহিত্যে যে গৈরিশ ছন্দ প্রবর্তিত হয়েছে তা আসলে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন কাব্যে; কিন্তু প্রতিটি পংক্তিতে চোদ্দ অক্ষর বজায় রাখা গদ্যের ক্ষেত্রে মূলত নাটকের জন্য অসুবিধাজনক। তখন মধুসূদন ভাঙা অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার করেন 'পদ্মাবতী' নাটকে। 'মাসিক বসুমতী'তে ছন্দশিল্পী মধুসূদনের ইতিবাচক সমালোচনার প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি ছন্দকার প্রবোধচন্দ্র সেনের অভিমত — "বাংলা ছন্দে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ দান অমিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধের প্রবর্তন।... বাংলার সরল পয়ারকে মধুসূদন একদিকে দিয়েছেন গতি, অপরদিকে দিয়েছেন শক্তি। এই দুই মহাকীর্তির জন্য বাঙালী কবিরা চিরকাল তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন।... মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার মৃদঙ্গে করাঘাত করে এই গুরুগম্ভীর ধ্বনিকে মন্দ্রিত করে তুলেছিলেন।"[৩০] এখানে সমালোচক সুরেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য প্রবোধচন্দ্র সেনের অভিমতের সঙ্গে ঐক্যপূর্ণ। বলাবাহুল্য, প্রবোধচন্দ্র সেনের অভিমত সুরেশচন্দ্র সেনের পরবর্তীকালের। কিন্তু গভীরতার দিক থেকে দুটি সমালোচনা ভিন্ন সময়ের হলেও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। 'মাসিক বসুমতী'তে ছন্দশিল্পী মধুসূদনের ইতিবাচক সমালোচনা পরিলক্ষিত হলেও প্রাবন্ধিকেরা এ প্রসঙ্গে নেতিবাচক দিকের প্রতিও আলোকপাত করিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কথা তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেও মধুসূদনের এই অভিনব প্রয়াস প্রশংসিত হয় নি। তবে আমরা এ প্রসঙ্গে বলতে পারি যে পরিণত বয়সে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপতা আর ছিল না। তাই 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে লিখতে পেরেছিলেন — "... সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"[৩১]

৭

'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত মধুসূদন বিষয়ক প্রবন্ধে সমালোচকেরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবি মধুসূদনের কাব্য এবং কবি প্রতিভা, নাট্যকার মধুসূদনের কৃতিত্ব-ব্যর্থতা, মধুসূদনের নারী ভাবনা, ছন্দশিল্পী মধুসূদন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৩৩৫-১৩৭০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে পঞ্চাশ-ষাটের দশক পর্যন্ত যখন বলা যায় মধুসূদন চর্চার প্রথম পর্যায়। ভিন্ন মত পোষণ করলেও একটি বিষয়ে প্রাবন্ধিকরা একমত হয়ে বলেছেন যে মধুসূদনের জীবন ও কাব্য যুগ-প্রেরণার সম্যক প্রতিফলন এবং তা যেমন তাঁর কবি-প্রতিভার প্রধান শক্তি তেমনি দুর্বলতারও কারণ। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে মধুসূদনের অবদান আসলে বাংলা গীতিকাব্যের গুরু বিহারীলালের মতোই বলে প্রাবন্ধিকের যে অভিমত তা উত্তর আধুনিক বাংলা

© Santiniketan Sahityapath

সাহিত্যের মধুসূদন সমালোচনার ক্ষেত্রেও অভিনব। মধুসূদনের কবিমানসের চর্চা যখন সেভাবে শুরুই হয়নি সেই প্রথম পর্যায়ের মধুসূদন সমালোচনার ইতিহাসে 'মাসিক বসুমতী'র এই প্রবন্ধগুলি যেমন স্মরণীয় তেমনি এই সমালোচনাগুলি বর্তমানে মধুসূদনের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পরেও মধুসূদনের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান বলে আমাদের অভিমত।

তথ্যসূত্র :

১। 'আশার ছলনে ভুলি', গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ২৪৩

২। 'বঙ্গাদর্শন', ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ২২৪

৩। 'মহাকবি মধুসূদন', সুরেশচন্দ্র ঘোষ, 'মাসিক বসুমতী', কার্তিক ১৩৪১, পৃ. ৪১

৪। ওই, পৃ. ৪৩

৫। ওই, পৃ. ৪২

৬। ওই

৭। ওই, পৃ. ৪১

৮। 'মধুসূদন', হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'মাসিক বসুমতী', ভাদ্র ১৩৬০, পৃ. ৭০৪

৯। ওই, পৃ. ৭০৫

১০। 'মধুসূদন: সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব', সম্পাদনা দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, পুথিপত্র, কলকাতা, ৫ অক্টোবর ১৯৫৬, পৃ. ৮৬

১১। 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দী', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৫১৩

১২। 'মধুসূদনের প্রহসন', নমিতা সেন, 'মাসিক বসুমতী', ফাল্গুন ১৩৭০, পৃ. ৮০৮

১৩। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, অশোক পুস্তকালয়, ৬৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, জানুআরি ১৯৬০, পৃ. ২৪৩

১৪। 'মধুসূদনের প্রহসন', ওই, পৃ. ৮০৯

১৫। ওই, পৃ. ৮০৭

১৬। ওই, পৃ. ৮০৮

১৭। ওই

১৮। 'মধুসূদন: সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব', ওই, পৃ. ২৫০

১৯। 'সাহিত্যসৃষ্টি' , 'সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, কার্তিক ১৪১১, পৃ. ৯২

২০। 'মাইকেল মধুসূদনের কাব্য বৈশিষ্ট্য', মঞ্জু মিত্র, 'মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৬১, পৃ. ২৫৬

২১। ওই, পৃ. ২৫৮

২২। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, সপ্তম সংস্কারণ ২০০৮, পৃ. ১৪৫

২৩। ওই

২৪। 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য', সুরেশচন্দ্র মৈত্র, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭৭, পৃ. ৫৪০

২৫। 'মধুসূদনের কবি কল্পনায় নারী', লীনা মিত্র, 'মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ. ৪৮৬

২৬। ওই, পৃ. ৪৮৫

২৭। ওই, পৃ. ৪৮৬

২৮। ওই, পৃ. ৪৮৭

© Santiniketan Sahityapath

২৯। ‘মহাকবি মধুসূদন’, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ৪২
৩০। ‘নূতন ছন্দ পরিক্রমা’, প্রবোধচন্দ্র সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১২, পৃ. ২৩১
৩১। ‘বিহারীলাল’, ‘আধুনিক সাহিত্য’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ. ১৭

—

© Santiniketan Sahityapath